Geography, Paper-IV
Part-II, B.A (General)
Economic Geography (অর্থনৈতিক ভূগোল)

প্রশ্নঃ অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা দাও। অর্থনৈতিক ভূগোলের আওতা বা পরিধি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ ভূগোলের যে অংশে প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে তাকে অর্থনৈতিক ভূগোল বলে।

অধ্যাপক হেবার্টসন বলেন,
" অর্থনৈতিক ভূগোল অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন পণ্যদ্রব্যের বন্টন নিয়ে আলোচনা করে"

অধ্যাপক আর. এন. ব্রাউন এর মতে,
" অর্থনৈতিক ভূগোল হল এমন একটি বিষয়' যা মানুষের কার্যাবলীর উপর জৈব ও অজৈব পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে।"

অধ্যাপক আর. ই. মারফি বলেন,
" পৃথিবীর বিভন্ন স্থানে বসবাসরত অধিবাসীদের জীবন যাপন প্রণালীর সামঞ্চসত্যা ও পার্থক্য নিয়ে যে শাস্ত্রে আলোচনা হয়, তাকে অর্থনৈতিক ভূগোল বলে।"

সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিকাশ বিস্তার ও ক্রমবিবর্তন এবং প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে এর কার্যকারণ সম্পর্কের বিচার বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনাকেই অর্থনৈতিক ভূগোল বলে।

অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি/ আওতাঃ

মানুষ ও তার পরিবেশ কিভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে তার বিশ্লেষণ ও ফলাফল নির্ণয় করাই হলো অর্থনৈতিক ভূগোলের আওতা বা পরিধি নিচের উপাদান গুলোর আলোকে অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি বর্ণনা কর হলোঃ-

১। মানুষঃ মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব। আর এই মানুষ তার কর্মকান্ডকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সুতারাং অর্থনৈতিক ভূগোল বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত মানুষের অতীত ও বর্তমান যুগের জীবনধারা বা কর্মকান্ড সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে । তাই মানুষের জন্ম -মৃত্যু, আচার-আচরণ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, জীবিকা, ধর্ম, বর্ণ শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা অর্থনৈতিক ভূগোলের আওতাভূক্ত/ পরিধিভূক্ত।

২। পরিবেশঃ সে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থান ও অবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাই হলো পরিবেশ। আর এই পরিবেশ কিভাবে মানুষের মানুষের অর্থনৈতিক কমকান্ডের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তার বিশদ

Email ID: *studygi01@gmail.com*

আলোচনা করাও অর্থনৈতিক ভূগোলের আওতাভূক্ত। পরিবেশ দুই প্রকারঃ
ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ।
খ) অপ্রাকৃতিক পরিবেশ।
প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো কিভাবে অর্থনৈতিক ভূগোলোর পরিটিভূক্ত/ আওতাভূক্ত তা নিচে আলোচিত হলোঃ

ক) প্রাকৃতিক পরিবেশঃ

a) ভূপ্রকৃতিঃ অঞ্চলভেদে পৃথিবীর ভূপ্রকৃতির ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ভূপ্রকৃতির বিভিন্নতার কারণ মানুষের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তার সার্বিক আলোচনা করা অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধিভূক্ত/ আওতাভূক্ত।

b) জলবায়ুঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু ও এর বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের ওপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনাও অর্থনৈতিক ভূগোলের আওতাভূক্ত/ পরিধিভূক্ত।

c) মৃত্তিকাঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকার প্রকারভেদ, ব্যবহার, উৎপাদন ক্ষমতা, গঠন প্রকৃতি ইত্যাদির বর্ণনা ও তথ্য প্রদান এবং মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর মাটির প্রভাবের আলোচনা করাও অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধিভূক্ত/ আওতাভূক্ত।

d) উদ্ভিদঃ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের ব্যবহার শ্রেণী বিভাগ বন্টন, উপকারিতা বনভূমির আয়তন ও বিস্তার ইত্যাদির বর্ণনা ও তথ্য প্রদান করা অর্থনৈতিক ভূগোলোর পরিধিভূক্ত/ আওতাভূক্ত।

e) খনিজ সম্পদঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদের বিশদ বিবরণ প্রদান করাও অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধিভূক্ত/ আওতাভূক্ত।

খ) অপ্রাকৃতিক পরিবেশঃ

অপ্রাকৃতি পরিবেশ বলতে সাধারনত জাতি,ধর্ম শিক্ষা আচার- ব্যবহার রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রভৃতিকে বুঝায়ে। এসব উপদান মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে আলোচনাও এর পরিধিভূক্ত/ আওতাভূক্ত।

৩। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডঃ
জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ যে সব কার্যাবলি সম্পাদন করে তাদের সমষ্টিকে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বলে। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

ক) প্রাথমিক পর্যায়ঃ কৃষিকাজ, মৎসশিকার ,বনজ ও খনিজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়ঃ প্রাথমিক পর্যায় থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রি যান্ত্রিক প্রকৃয়ায় পরিবর্তন করে অধিকর্তর ব্যবহার উপযোগী করে তোলা। যেমন- ধান হতে চাল, দুধ হতে দই- পণির -ছানা, লৌহ আকরিক হতে ইস্পাত ইত্যাদি।

গ) দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ব্যবসা-বানিজ্য, শিক্ষকতা,চাকুরী ও সেবামূলক কর্মকান্ড এ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অন্তর্গত।

৪। সম্পদের বিস্তৃতিঃ সম্পদ বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যেমনঃ- কৃষিসম্পদ, মৎসসম্পদ, খনিজসম্পদ ইত্যাদি।

Email ID: *studygi01@gmail.com*

সম্পদ মূলত প্রাকৃতিক। মানুষ নিজের প্রয়োজনমত তার পরিবর্তন করে নেয়। বিস্তৃতি হলো কোন সম্পদ কোথায় এবং কেন অবস্থান করে তার আলোচনা করা। সুতারাং সম্পদের বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনাও অর্থনৈতিক ভূগোলোর পরিধিভূক্ত/ আওতাভূক্ত।

৫। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাঃ সম্পদ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পারস্পরিক সম্পর্কে নিয়ে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো একটি দেশের জনগণ কতৃক কতগুলো নিয়ম বা প্রণালীর সমষ্টি যার মাধমে মানুষের অভাব মেটানোর জন্য সম্পদ ব্যবহত হয়। দেশের সম্পদ ব্যবহার করে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন,ভোগ এবং বিতরণের যে সংগঠিত ব্যবস্থা থাকে তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। যেমনঃ-সমাজ তান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং মিশ্র অর্থব্যবস্থা। অর্থনৈতিক ভূগোল এসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে।

৬। অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ অর্থনৈতিক ভূগোল বিশ্বের করে। মানুষও তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাও তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ করে। মানুষ ও তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, বিশ্বের, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সম্পদের বিস্তৃতি প্রভৃতির সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া হলো অর্থনৈতিক ভূগোলোর অন্তভূক্ত।

সুতারাং অর্থনৈতিক ভূগোলোর পরিধি/ অওতা অত্যন্ত ব্যাপক। উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান,প্রযুক্তি,বিভিন্নমূখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উদ্ভদ অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধিকে উক্তোরোত্তর বিস্তৃত করে তুলছে।

প্রশ্নঃ সম্পদের বিশিষ্ট গুলি আলোচনা কর।

উত্তরঃ সম্পদ হলো মানুষের পরিবেশের সেই সমস্ত বিষয় সমূহ, যা মানুষের চাহিদা পূরণ করে এবং সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করে। কোন বস্তু বা পদার্থ সম্পদ কিনা তা নির্ভর করে তিনটি বিশেষ গুণের ওপর- প্রথমটি উপযোগিতা, দ্বিতীয়টি কার্যকারিতা এবং তৃতীয়টি চাহিদার ব্যাপ্তি ও গভীরতা। তিনটি গুণের ওপর ভিত্তি করে সম্পদের বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-

১) উপযোগিতাঃ সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উপযোগিতা। অর্থাৎ কোন পদার্থকে সম্পদ হতে হলে তার মধ্যে এমন একটি বিশেষ গুণ থাকতে হবে যার সাহায্যে সে মানুষের কোন নির্দিষ্ট অভাব পূরণ করতে পারবে। যেমন-কয়লা জ্বালানি হিসাবে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে মানুষের চাহিদা পূরণ করে বা অভাব মোচন করে। তাই কয়লা সম্পদ।

২) কার্যকারিতাঃ কোন বস্তুকে সম্পদ হতে হলে তার অবশ্যই কাজ করার ক্ষমতা বা কার্যকারিতা থাকতে হবে। যেমন- জলকে সেচের কাজে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, শিল্পক্ষেত্রে ইত্যাদি নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। জলের এই কার্যকরী ক্ষমতার জন্য জলকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩) ব্যবহারযোগ্যতাঃ যে বস্তু বা দ্রব্যের ব্যবহার যত বেশি সেই বস্তুটি ততো গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বিবেচিত হয়। যেমন বর্তমানে আকরিক লোহার পরিবর্তে স্ক্র্যাপ লোহা বা ছাঁট লোহার ব্যবহার বেড়ে

Email ID: *studygi01@gmail.com*

চলেছে। স্ক্র্যাপ লোহার ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য একে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

৪) **গ্রহণযোগ্যতাঃ** কোন বস্তুকে সম্পদ হতে হলে তাকে অবশ্যই মানুষের গ্রহণযোগ্য হতে হবে। কিন্তু সব সম্পদ সকল মানুষের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। জাতি, ধর্ম ও সময়ের তারতম্যে সম্পদের গ্রহণযোগ্যতার পরিবর্তন হয়। যেমন- হিন্দুদের কাছে গোমাংসের গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় এটি তাদের কাছে সম্পদ নয়। কিন্তু মুসলমানদের কাছে গোমাংস সম্পদ।

৫) **সার্বজনীন চাহিদাঃ** যে সকল বস্তুর ব্যাপক ও সার্বজনীন চাহিদা আছে তাদের সম্পদ হিসাবে গণ্য করা। যেমন- জল,আলো,বাতাস ইত্যাদির সার্বজনীন চাহিদা থাকায় এগুলিকে সম্পদ বলা হয়।

৬) **পরিবেশ মিত্রতাঃ** কোন বস্তুকে সম্পদ হতে হলে তাকে পরিবেশ মিত্র হতে হবে অর্থাৎ যে বস্তু ব্যবহার করলে পরিবেশের ক্ষতি হয় না বা সামান্য ক্ষতি হয় কিংবা বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বিপন্ন হয় না সেগুলিকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন-জল থেকে জল বিদ্যুৎ, বায়ু থেকে বায়ু বিদ্যুৎ, সূর্যালোক থেকে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় পরিবেশ দূষিত হয় না। তাই এগুলিকে পরিবেশ মিত্র সম্পদ বলা হয়।

প্রশ্নঃ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ কর।

উত্তরঃ ভূগোলের ভাষায় কোন বস্তু বা পদার্থ সম্পদ নয়, ওই বস্তু বা পদার্থের মধ্যে যে কার্যকরীতা ও উপযোগিতা থাকে তাকে সম্পদ বলা হয়।এই সম্পদকে প্রধানত কার্যকারিতা ও চাহিদা পূরণের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা হয়।

A) সম্পদ সৃষ্টির উপাদান অনুসারে সম্পদের শ্রেণীবিভাগঃ সম্পদ সৃষ্টির উপাদান অনুসারে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১) **প্রাকৃতিক সম্পদঃ** যে সমস্ত সম্পদ প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া যায় তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। সমস্ত প্রাকৃতিক জৈবিক ও অপার্থিব প্রকৃতিজাত উপাদান হলো প্রাকৃতিক সম্পদ।
উদাহরণ-সূর্যকিরণ,বায়ু প্রবাহ, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি।

২) **মানবিক সম্পদঃ** মানুষ তার চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে যে সকল সম্পদ সৃষ্টি করে, তাদের মানবিক সম্পদ বলে।
উদাহরণ-শ্রমিকের কর্মদক্ষতা, মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ইত্যাদি।

৩) **সাংস্কৃতিক সম্পদঃ** যে সমস্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির নিরপেক্ষ উপাদানগুলিকে সম্পদে পরিণত করে, সেগুলিকে সাংস্কৃতিক সম্পদ বলে।
উদাহরণ-বিজ্ঞানচেতনা, কারিগরি বিদ্যা, শিক্ষা, প্রকৌশল ইত্যাদি।

B) জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সম্পদের শ্রেণীবিভাগঃ জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সম্পর্কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১) **জৈব সম্পদঃ** যে সমস্ত সম্পদ প্রাকৃতিক পরিবেশের সজীব উপাদান থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাদের জৈব সম্পদ বলে।
উদাহরণ-বনভূমির কাঠ, মৎস্য ক্ষেত্রের মাছ, পশম,দুধ বন্যপ্রাণী ইত্যাদি।

২) **অজৈব সম্পদঃ** মানুষের ব্যবহারের উপযোগী যেসব জড় সম্পদকে প্রাকৃতিক

Email ID: *studygi01@gmail.com*

পরিবেশে কঠিন তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায়, তাদের অজৈব সম্পদ বলে।
উদাহরণ-জল, আকরিক লোহা, মাটি ইত্যাদি।

C) স্থায়িত্ব বা ক্ষয়িষ্ণুতার তারতম্য অনুসারে সম্পদের শ্রেণীবিভাগঃ স্থায়িত্ব বা ক্ষয়িষ্ণুতার কোন তারতম্য অনুসারে সম্পর্কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা যথা-

১) পুনর্ভব বা পূরনশীল সম্পদঃ যেসব সম্পদের যোগান সীমিত এবং বারবার ব্যবহারের ফলে সাময়িকভাবে হ্রাস পায়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর পুনরায় যোগান বৃদ্ধি পায় ও ক্ষয় পূরণ হয়ে যায়; তাদের পুনর্ভব বা পূরনশীল বা অক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বলে।
উদাহরণ-বনভূমি, মাটির উর্বরতা ইত্যাদি।

২) অপুনর্ভব বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদের পরিমাণ সীমিত এবং ক্রমাগত ব্যবহার করলে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়, তাদের অপুনর্ভব বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বলে।
উদাহরণ-কয়লা, খনিজ তেল, আকরিক লোহা ইত্যাদি।

৩) অবাধ বা প্রবাহমান সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করার ফলেও ফুরিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই অর্থাৎ ক্রমাগত ব্যবহার করার ফলেও যাদের জোগানো বিরত থাকে, তাদের প্রবাহমান বা অফুরন্ত বা মুক্ত গতি বা অবাধ সম্পদ বলে।
উদাহরণ-সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোত থেকে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি।

৪)রুদ্ধ প্রবাহমান সম্পদঃ অবাধ ও পূরনশীল সম্পদ কখনোই ফুরিয়ে যায় না। কিন্তু এমন অনেক পুনর্ভব সম্পদ আছে যেগুলি অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে একসময় নিঃশেষিত হয়ে অপুনর্ভব সম্পদের পরিণত হতে পারে। এদের রুদ্ধ প্রবাহমান সম্পদ বলে।
উদাহরণ-নির্বিচারে অরণ্যবিনাশের ফলে একসময় ওই অরণ্য বা বনভূমি অপুনর্ভব সম্পদে পরিণত হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে বনভূমি হলো রুদ্ধ প্রবাহমান সম্পদ।

৫) আবর্তনীয় গচ্ছিত সম্পদঃ যে সমস্ত অপুনর্ভব সম্পদকে সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা যায়, তাদের আবর্তনীয় গচ্ছিত সম্পদ বলে।
উদাহরণ-ছাঁট লোহাকে গলিয়ে পুনরায় লোহাতে পরিণত করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। তাই ছাঁট লোহা হলো আবর্তনীয় গচ্ছিত সম্পদ।

D) অবস্থান বা বন্টন অনুসারে সম্পদের শ্রেণীবিভাগঃ অবস্থান বা বন্টন অনুসারে সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।যথা-

১) একমাত্র লভ্য সম্পদ বা অদ্বিতীয় সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদ পৃথিবীর একটিমাত্র জায়গায় পাওয়া যায়, তাদের একমাত্র লভ্য সম্পদ বা অনন্য সম্পদ বা অদ্বিতীয় সম্পদ বলে।
উদাহরণ-গ্রীনল্যান্ডের ক্রায়োলাইট।

২) দুষ্প্রাপ্য সম্পদঃ যেসব সম্পদ সহজে পাওয়া যায় না, পৃথিবীর নামমাত্র কয়েকটি স্থানে পাওয়া যায়; তাদের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বলে।
উদাহরণ-ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার টিন, ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্র ইত্যাদি।

৩) সহজলভ্য সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদ পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ জায়গায় পাওয়া যায়, তাদের সহজলভ্য সম্পদ বলে।
উদাহরণ-কৃষিজমি, বনভূমি ইত্যাদি।

৪) সর্বত্র লভ্য সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদ পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় তাদের সর্বত্র লভ্য সম্পদ বলে।
উদাহরণ-সূর্যালোক, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি।

Email ID: *studygi01@gmail.com*

E) মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদের শ্রেণীবিভাগঃ মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১) ব্যক্তিগত সম্পদঃ সমস্ত সম্পদ মানুষের নিজের অধিকারে থাকে, তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ বলে।
উদাহরণ-জমি, বাড়ী, গাড়ি ইত্যাদি।

২) সামাজিক সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদ মানুষের সামাজিক চাহিদা মেটায় এবং যাদের মালিকানা সমাজের অধীনে থাকে, তাদের সামাজিক সম্পদ বলে।
উদাহরণ-বিদ্যালয়, পাঠাগার, হাসপাতাল ইত্যাদি।

৩) জাতীয় সম্পদঃ দেশ বা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সম্পদ গুলিকে জাতীয় সম্পদ বলে। এই সম্পদ গুলির উপর দেশের সব মানুষের অধিকার আছে।
উদাহরণ-রেলপথ, জাতীয় সড়কপথ, সরকারি অফিস- আদালত ইত্যাদি।

৪) আন্তর্জাতিক সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদ নির্দিষ্ট কোন দেশ বা ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতির নয়, সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত; তাদের আন্তর্জাতিক সম্পদ বা সার্বজনীন সম্পদ বলা হয়।
উদাহরণ-সূর্যালোক, মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি।

F)অনুভব বা উপলব্ধি অনুসারে সম্পদের শ্রেণীবিভাগঃ অনুভব বা উপলব্ধি অনুসারে সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা-

১) বস্তুগত সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদ স্পর্শযোগ্য এবং পদার্থের কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় যেকোনো একটি অবস্থান অধীন, তাদের বস্তুগত সম্পদ বলে।
উদাহরণ-আকরিক লোহা, কয়লা ইত্যাদি।

২) অবস্তুগত সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদ স্পর্শযোগ্য নয় এবং যাদের কোন বস্তুগত অস্তিত্ব নেই, তাদের অবস্তুগত সম্পদ বলে। এই সম্পদগুলি মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া যায়।
উদাহরণ-শিক্ষাগত যোগ্যতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি।

G) প্রাপ্যতা অনুসারে সম্পদের শ্রেণীবিভাগঃ প্রাপ্যতা অনুসারে সম্পর্কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১) বিকশিত সম্পদ বা প্রকৃত সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদ শুধুমাত্র গচ্ছিত বা আবদ্ধ অবস্থায় নেই, প্রয়োজন মতো ক্রমাগত ব্যবহার করা ব্যবহার করা হচ্ছে; তাদের বিকশিত বা প্রকৃত বা সমৃদ্ধ সম্পদ বলে।
উদাহরণ-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের জলবিদ্যুৎ।

২) সম্ভাব্য সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব ও ব্যবহারযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন আর্থসামাজিক বা প্রাকৃতিক বাধার কারণে তাদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়নি; কিন্তু ভবিষ্যতে ব্যবহার বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে, তাদের সম্ভাব্য সম্পদ বলে।
উদাহরণ-কেনিয়া ও কঙ্গোর সম্ভাব্য জলবিদ্যুৎ, ভারতের সম্ভাব্য সৌরবিদ্যুৎ ইত্যাদি।

-:সমাপ্ত:-

Email ID: *studygi01@gmail.com*